লুটপাট সব ব্যাংকেই

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

একের পর এক লুটপাটের ঘটনা বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে তৈরি করেছে নৈরাজ্য ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি। গ্রাহকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ভীতি ও আস্থাহীনতা। ঋণখেলাপি থেকে শুরু করে ব্যাংকের টাকা লুট করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক সবাই। মহাজোট সরকারের গত ৫ বছরে সরকারি পাঁচটি ব্যাংক থেকে মোট ১৩ হাজার কোটি টাকা লোপাট করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোপাট হয়েছে দেড় হাজার কোটি টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নানা ধরনের টেকনিক খাটিয়ে এ টাকা লুট করা হয়েছে। অভিনব কায়দায় এ লুটপাটে ইন্ধন জুগিয়েছেন, পথ বাতলে দিয়েছেন পরিচালকরা। তাদের চাপে পড়ে ব্যাংকের কর্মকর্তারা অখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছেন। এসব ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যাংকিং নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয়নি। দুদক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে পাঁচটি সরকারি ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকা। এতে সরকারি ব্যাংকগুলোতে মূলধনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বেড়ে গেছে খেলাপি ঋণ। খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত প্রভিশন রাখতে হচ্ছে। বাড়তি প্রভিশন রাখতে গিয়ে ব্যাংকের মুনাফায় ধস নেমেছে। শুধু মুনাফায় ধস নামেনি, একের পর এক ব্যাংক কেলেঙ্কারির কারণে ব্যাংকিং সেক্টরে আস্থার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আস্থার সঙ্কট দেখা দেয়ায় এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের বিল কিনছে না। এ অবস্থায় আমদানি রফতানি ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা নেমে এসেছে। অনেক ব্যবসায়ী এর প্রভাবে ব্যাংকের খাতায় ঋণ খেলাপি হিসেবে নাম লিখিয়েছেন। এতে বেড়ে গেছে খেলাপি ঋণ। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে খেলাপি ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন সরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকের পরিচালকরা ভুয়া কোম্পানি তৈরি করে ঋণ দিয়ে আবার অবলোপন করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী মহাজোট সরকারের পাঁচ বছরে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। এসব অনিয়ম কেলেঙ্কারি নিয়ে চিঠি চালাচালি করলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো একের পর এক কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে।

হলমার্ক ও সোনালী ব্যাংক : মহাজোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলে ব্যাংকিং খাতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল সোনালী ব্যাংক বা হলমার্ক কেলেঙ্কারি। হলমার্ক নামক একটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠান ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক থেকে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান কাজী বাহারুল ইসলাম ও সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলীর এ ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। সোনালী ব্যাংকের সে সময়ের পরিচালক জান্নাত আরা হেনরী, সাইমুম সরোয়ার কমল, রোমেল ও সুভাষ সিংহ রায়কেও এ বিষয়ে দুদক তলব পর্যন্ত করেছিল। হলমার্কের চেয়ারম্যান জেসমিন আরা ইসলাম এবং এমডি তানভীর মাহমুদকে এ সময় জেলে নেয়া হলেও বাকিদের দুদক জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়। ফলে ওই অর্থ লোপাটের আর কোনো কূলকিনারা হয়নি। দুদক সূত্রে জানা যায়, হলমার্ক কেলেঙ্কারির সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার ৪০ শতাংশ টাকা মালয়েশিয়ায় পাচার করা হয়, ৩০ শতাংশ টাকা চলে যায় আমেরিকায় আর বাকি ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়। হলমার্ক মাত্র ২৮২ কোটি টাকা ব্যাংকে জমা দেয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হলমার্ক গ্রুপ থেকে ঘুষ নিয়েই সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তারা তাদের জালিয়াতির সব ধরনের সুযোগ করে দিয়েছিল। দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা অন্তত আটজন কর্মকর্তা নানা উপায়ে অর্থ নিয়েছিল হলমার্ক থেকে। একাধিক কর্মকর্তা বিদেশে চিকিৎসা ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্যও টাকা নেন হলমার্ক থেকে। দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে হলমার্কের এমডি তানভীর মাহমুদ গত ১৮ অক্টোবর বলেন, রূপসী বাংলা হোটেল (সাবেক শেরাটন) শাখা থেকে ব্যাংকের সহায়তায় জালিয়াতি করে হলমার্ক ২ হাজার ৮শ ৮৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে। শাখা ব্যবস্থাপক এম আজিজুর রহমান এ কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন।

জানা যায়, এক রূপসী বাংলা শাখা থেকেই আত্মসাৎ করা হয় ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। হলমার্ক ছাড়াও আরো ৪টি প্রতিষ্ঠান একই কায়দায় এই শাখা থেকে আরো এক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। ওই চারটি প্রতিষ্ঠান হলো– টি অ্যান্ড ব্রাদার্স, প্যারাগন নিট, নকশি নিট এবং ডি এন স্পোর্টস।

টি অ্যান্ড ব্রাদার্স, প্যারাগন নিট ও নকশি নিটের মালিকরা আগে হলমার্কে চাকরি করতেন। পরে নিজেরা কোম্পানি খুলে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। এই তিনজন হলেন– ব্রাদার্সের পরিচালক তসলিম হাসান, নকশি নিট কম্পোজিটের মালিক আবদুল মালেক এবং প্যারাগনের সাইফুল ইসলাম রাজা। হলমার্ক গ্রুপের অর্থ জালিয়াতির সঙ্গে শুরুতেই এই তিনজনের সংশ্লিষ্টতা ছিল। আর ব্যাংকের ৮ কর্মকর্তা ও একজন পরিচালক সরাসরি ঘুষ নিয়েছিলেন।

সোনালী ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালে ব্যাংকটি ঋণ দেয় ১৮ হাজার ২শ ৪৪ কোটি টাকা। ওই বছর আদায় হয় ৯শ ৬৫ কোটি টাকা। ২০১১ সালে ঋণ দেয় ২০ হাজার ৬শ কোটি টাকা, ২০১২ সালে ঋণ দেয় ২১ হাজার ২শ ৬৩ কোটি এবং ২০১৩ সালে ঋণ দেয় ২৫ হাজার ৮শ ৬২ কোটি টাকা।

২০১১ সালে আদায় হয় ২ হাজার ৫শ কোটি টাকা, ২০১২ সালে আদায় হয় ৩ হাজার ৬শ ১৮ কোটি এবং ২০১৩ সালে আদায় হয় ৬ হাজার ২শ ১৯ কোটি টাকা।

অগ্রণী ব্যাংকে লুটপাট : সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে ভালো অবস্থায় ছিল অগ্রণী ব্যাংক। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যাংকটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক খোন্দকার বজলুল হক এবং এমডি হন সৈয়দ আবদুল হামিদ। তাদের ব্যক্তিগত

দুর্নীতি ও চাওয়া-পাওয়ার কারণে অর্থনৈতিকভাবে ভালো থাকা এ ব্যাংকটি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান ও এমডির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে।

দুদকে দায়ের করা অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বর্তমান চেয়ারম্যান ড. খন্দকার বজলুল হক ও এমডি সৈয়দ আবদুল হামিদ উভয়েই ২০০৯ সালে নিয়োগ পান। বর্তমানে উভয়েই সাড়ে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযোগপত্র মতে, ২০০৯ সাল থেকে অগ্রণী ব্যাংকের সব নিয়োগ পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্দকার বজলুল হক তার নিজ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে নিয়েছেন, যে কারণে নিজের পছন্দের লোকদের নিয়োগ দিয়েছেন। এই নিয়োগ দিতে তিনি প্রার্থীদের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ব্যাংকের সিএসআর থেকে ৫ বছরে শত কোটি টাকা লোপাট করেছেন। তিনি খুলনায় নিজ মালিকানায় সাউদার্ন নর্থ নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। তিনি পরীবাগে ফ্ল্যাট ও উত্তরায় বাড়ি কিনেছেন। একটি ব্রোকারেজ হাউসের মালিক হয়েছেন। তিনি গত পাঁচ বছরে ২০ বার ব্যাংকের টাকায় বিদেশ ভ্রমণ করেন। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমডি সৈয়দ আবদুল হামিদও দুর্নীতি করে চলেছেন। নিয়োগবাণিজ্য করতে তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁস করান বলে অভিযোগ রয়েছে। গুলশান, ধানমণ্ডিতে ফ্ল্যাট ও জিগাতলায় ৫ তলা বাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, চট্টগ্রামের লালদীঘি পূর্বপাড় শাখায় ১৬০ কোটি টাকার জালিয়াতি করে এইচআর গ্রুপ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে বেরিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, জনতা, রূপালী ও অগ্রণী ব্যাংকের প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণে অনিয়ম রয়েছে। এসব বিষয়ে তদন্ত শেষ পর্যায়ে। এর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ অনিয়ম রয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালে অগ্রণী ব্যাংকে ঋণ বিতরণ করা হয় ১২ হাজার ২শ ৪৪ কোটি টাকা, এ বছর ঋণ আদায় হয় ৭শ ১৫ কোটি টাকা। ২০১০ সালে ঋণ দেয়া হয় ১৬ হাজার ৩শ ২৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা। ঋণ আদায় হয় ৯শ ৫৭ কোটি টাকা। ২০১১ সালে ঋণ দেয়া হয় ১৯ হাজার ৪শ ৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা, আদায় হয় ১ হাজার ৩৩ কোটি টাকা। ২০১২ সালে ঋণ দেয়া হয় ২১ হাজার ২শ ৬৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা। আদায় হয় ৮শ ৪৩ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে ঋণ দেয়া হয় ২০ হাজার ২শ ৯৬ কোটি ৫৭ লাখ, ঋণ আদায় হয় ২ হাজার ৪শ ২৫ কোটি টাকা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে রূপালী ব্যাংক : জোট সরকারের সময় রূপালী ব্যাংক লুটপাটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এক সময় বিদেশিদের কাছে এটি বিক্রি করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। সেই ব্যাংকটি এখনো চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১০ সালে ব্যাংকটির মোট আমানত ছিল ৯ হাজার ১১২ দশমিক ৩৮ কোটি

প্রিমিয়ার ব্যাংকে জালিয়াতি ১৩৩ কোটি ৯৬ লাখ টাকা

ক্ষমতাসীন দলের এমপি ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান বিএইচ হারুনের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ব্যাংক জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জানা গেছে, ঝালকাঠির সরকারদলীয় সংসদ সদস্য বিএইচ হারুন বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত প্রিমিয়ার ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালে তার ব্যবসায়ী পার্টনার জাপা (মঞ্জু) নেতা মোঃ খলিলুর রহমানের ব্যাংক হিসাব থেকে চেক জালিয়াতি করে প্রথম দফায় ৬২ কোটি টাকা তুলে নেন। দুদক সূত্রে জানা গেছে, জাপা (মঞ্জু) নেতা খলিলুর রহমান একজন ব্যবসায়ী। প্রিমিয়ার ব্যাংক বংশাল ব্রাঞ্চে তার একটি হিসাব রয়েছে। এমপি বিএইচ হারুন ও খলিলুর রহমান একই জেলার (ঝালকাঠি) অধিবাসী সেই সুবাদে তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা ৩ জন মিলে একটি কনস্ট্রাকশন ফার্ম গড়ে তোলেন।

প্রায় ১২ বছর ধরে তারা এই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। তাদের কন্সট্রাকশন ফার্মের নাম মেসার্স রুমী এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮ সালে সৌদি আরবের অনুদানে সিডর আক্রান্ত এলাকায় ১৫ হাজার আবাসিক ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ পায়। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য রুমী এন্টারপ্রাইজকে মোট ২০৩ কোটি টাকা দেয় সৌদি আরব সরকার। কার্যাদেশ পাওয়ার পর খলিলুর রহমান প্রিমিয়ার ব্যাংকের বংশাল শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন।

পরবর্তী সময়ে এই অ্যাকাউন্টে সৌদি সরকার ৭টি চেকের মাধ্যমে ২০৩ কোটি টাকা প্রদান করে। অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হলে হিসাব মালিক খলিলুর রহমান ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ৬৯ কোটি ১১ লাখ টাকা তোলেন। বাকি ১৩৩ কোটি ৯৬ লাখ টাকা জমা থেকে যায়। ডিসেম্বর মাসে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ কোটি ৫ লাখ টাকা ঋণ সমন্বয় করতে গিয়ে দেখা যায় অ্যাকাউন্টটি ক্লোজ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শাখা ম্যানেজার বিষয়টি খলিলুর রহমানকে অবহিত করেন। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ব্যাংকে আসেন এবং খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, এমপি বিএইচ হারুন, প্রিমিয়ার ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু হানিফ খান ও ম্যানেজার সামসুদ্দিন আহমেদ যৌথভাবে খলিলুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে ২০১৩ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর ২০০৮-এ অ্যাকাউন্টের সব টাকা তুলে নিয়েছেন এবং হিসাবটি বন্ধ করে দিয়েছেন। বিষয়টি তিনি প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে লিখিতভাবে জানান এবং দ্রুত প্রতিকার চান। এ অভিযোগের ভিত্তিতে প্রিমিয়ার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২-৩টি মিটিং আহ্বান করলেও কোনো প্রতিকার দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে খলিলুর রহমান লিখিভাবে অর্থমন্ত্রী, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে বিষয়টি জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে একটি তদন্তেই চাঞ্চল্যকর এই জালিয়াতির ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে। তদন্তে দেখা যায় খলিলুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে টাকাগুলো তুলে নেয়া হয়েছে। ব্যাংকের কর্মকর্তারা এ ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোঃ রেজাকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, কোনো ক্রিমিনাল এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। বিষয়টি এসিসিকে পুনর্তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এসিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে, প্রিমিয়ার ব্যাংকের কর্মকর্তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বিএইচ হারুন জড়িত কিনা সেটা বলতে পারছি না।' এ বিষয়ে বংশাল শাখার ম্যানেজার সামসুদ্দিন বলেন, 'যে যে চেকে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে ওই চেকের স্বাক্ষরে বেশ গরমিল লক্ষ্য করা গেছে।'

চাঞ্চল্যকর এই ব্যাংক জালিয়াতি সম্পর্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার খলিলুর রহমান বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে বিএইচ হারুন ও ব্যাংক কর্মকর্তারা যোগসাজশে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে জাল স্বাক্ষরে টাকাগুলো তুলে নিয়েছেন।'

তিনি আরো বলেন, 'এই টাকা বিএইচ হারুনের পকেটেই আছে। না হলে ২০০৮ সালে বিএইচ হারুন ৬ কোটি ৬২ লাখ টাকা কীভাবে ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগ করলেন? তিনি কীভাবে প্রতি মাসে ৩০ লাখ টাকা ব্যবসায় ব্যয় করেন? কীভাবে তার স্ত্রী কোনো ব্যবসা বা চাকরি না করেও ক্যাপিটাল মার্কেটে ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন? কীভাবে মিরপুর গাজীপুর বনানী ও বারিধারায় ৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকার প্লট ক্রয় করেছেন? এসব টাকা বিএইচ হারুন ও তার স্ত্রী কোথায় পেলেন?'

এ প্রসঙ্গে দুদকের একজন কর্মকর্তা বলেন, প্রিমিয়ার ব্যাংকে যে চেক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে তা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ব্যাংক কর্মকর্তারা সরাসরি জড়িত না থাকলে এমনটি সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের এমপি বিএইচ হারুনের বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থসম্পদ উপার্জনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেগুলো দুদকের অনুসন্ধানে রয়েছে। অচিরেই তার বিরুদ্ধে দুদকের আইনে মামলা করা হবে। একই সঙ্গে খলিলুর রহমানের ব্যাংক হিসাব থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়া ১৩৪ কোটি টাকার বিষয়ে তদন্ত শেষ পর্যায়ে। এ ক্ষেত্রে পৃথক মামলা করা হবে।

টাকা। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ হাজার ৭২৩ দশমিক ৪০ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ হাজার ৬৫৯ দশমিক ৮৮ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে এর মোট আমানত দাঁড়ায় ১৭ হাজার ৭৯৫ কোটি টাকায়। ২০১০ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম ছিল ৬ হাজার ৬০৪ দশমিক ৯০ কোটি টাকা। ২০১১ সালে তা হয় ৭ হাজার ৬৫২ দশমিক ৪৯ কোটি টাকা। ২০১২ সালে ছিল ৯ হাজার ৫৪ দশমিক ১৬ কোটি এবং ২০১৩ সালে ১০ হাজার ৭৪২ কোটি টাকা।

২০১০ সালে ঋণ আদায় হয় ৪ হাজার ৭৯০ কোটি, ২০১১ সালে ৫ হাজার ৫৩ কোটি, ২০১২ সালে ৬ হাজার ৩১১ কোটি এবং ২০১৩ সালে ৬ হাজার ১শ কোটি টাকা।

বিদেশেও ঋণ কেলেঙ্কারি জনতা ব্যাংকের : দেশি ব্যাংক লুটেরাদের লুটপাটের শিকার হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক। জনতা ব্যাংক সাধারণ বীমা শাখায় ৭৫ কোটি টাকা জালিয়াতি করে এইচআর গ্রুপ। বিসমিল্লাহ গ্রুপ জনতা ব্যাংক থেকে ৩৯২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা, প্রাইম ব্যাংক থেকে ৩০৬ কোটি ২২ লাখ টাকা, যমুনা ব্যাংক থেকে ১৬৩ কোটি ৭৯ লাখ, শাহজালাল ব্যাংক থেকে ১৪৮ কোটি ৭৯ লাখ ও প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ৬২ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ঋণ নেয়ার নামে মোট ১২শ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে দেশের বাইরে পাচার করে।

দেশের পর বিদেশেও ঋণ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছেন জনতা ব্যাংক কর্মকর্তারা। ভুয়া তথ্য দিয়ে এক বিদেশি নাগরিকের নামে ১০ কোটি টাকা ঋণ সৃষ্টি করে তা নিজেদের পকেটে পুরেছেন। জনতা ব্যাংক দুবাই শাখায় এ ঘটনা ঘটেছে। জানা যায়, জনতা ব্যাংকের আরব আমিরাতের দুবাই শাখায় কোনো ধরনের ঋণ হিসাব না খুলেই ভুয়া ডকুমেন্ট দিয়ে মেসার্স স্টিভেন ফ্রস্ট নামে ১০ কোটি টাকার এলসি দায় দেখানো হয়। কিন্তু বিদেশি এই ব্যক্তির নামে কোনো ধরনের এলসি দায় পরিশোধ না করে অর্থ আত্মসাৎ করেন কর্মকর্তারা। এ বছরের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে এটা ধরা পড়ে। এই অপকর্মে তিন কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন, তারা হলেন– সংশ্লিষ্ট শাখার ডিজিএম শফিকুল ইসলাম, এজিএম আবুল মোমেন এবং ইও এটিএম শাহাবুদ্দিন। এই তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

পূবালী ব্যাংকে গায়েব ২০৮ কোটি : পূবালী ব্যাংকের সরকারি হিসাব থেকে ১০৮ কোটি টাকা গায়েব হয়ে গেছে। তাছাড়া ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে আরো ১০০ কোটি টাকা গায়েব হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে পূবালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখা, নরসিংদী জেলার মাধবদী শাখা ও নারায়ণগঞ্জের আঞ্চলিক শাখা থেকে সরকারের ১০৮ কোটি টাকা খোয়া যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় ব্যাংকের ১৫ জন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পূবালী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বাণিজ্যিক অডিট পরীক্ষায়। ব্যাংকটির বিভিন্ন শাখার অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে যে সব অডিট আপত্তি দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়ে গেছে, ওই সব অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার পাশাপাশি দোষী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে অডিট রিপোর্টে। সম্প্রতি এ ধরনের একাধিক রিপোর্ট বাণিজ্যিক অডিট অধিদফতর থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

কৃষি ব্যাংক : অর্থ লুটপাট ও পাচারে কৃষি ব্যাংকও পিছিয়ে নেই। কৃষি ব্যাংক কুষ্টিয়া জেলা সদর শাখায় ভুয়া ঠিকানা ও কাগজপত্র ব্যবহার করে ব্রাদার্স এন্টারপ্রাইজ, শাহনেওয়াজ এন্টারপ্রাইজ, এম আর করপোরেশন এবং সাতক্ষীরার পলাশ পোল এলাকার মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ, ভোমরা এলাকার শাওন এন্টারপ্রাইজ ৮৪টি এলসি খোলেন। এই এলসির আওতায় ৪৪৫ কোটি ৩০ লাখ ৭১ হাজার ৯৪০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। তারা এলসির বিপরীতে ৩০৭ কোটি ৩৩ লাখ ৭৮ হাজার ২৮০ টাকা ব্যাংক থেকে নেন। এর মধ্যে ২৭৫ কোটি ৭৭ লাখ ৬৪ হাজার ২০৫ টাকা পরিশোধ করেন। বাকি ৩১ কোটি ৫৬ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৫ টাকা পরিশোধ না করে আত্মসাৎ করেন। এ বিষয়ে মামলাও হয়েছে।

বেসিক ব্যাংক : বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চু মোটামুটি একাই গ্রাস করেছেন বেসিক ব্যাংক। দুদকের অনুসন্ধানে জানা যায়, মহাজোট সরকারের পাঁচ বছরে বেসিক ব্যাংক থেকে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা লুট করা হয়। আর এতে নেতৃত্ব দেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চু, এমডি কাজী ফখরুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোনায়েম খান ও তার স্ত্রী।

দুদকের তদন্ত সূত্রে জানা যায়, শেখ আবদুল হাই বাচ্চু লোপাট করেছেন ব্যাংকের আড়াই হাজার কোটি টাকা। রাজধানীর মহাখালী ও বনানী ডিওএইচএসে তার ৩০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় তার শাসনামলে ব্যাংক থেকে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা কোনোদিন আদায় হবে না। এসব ঋণের কোনো জামানত নেই। এসব ঋণ থেকে তিনি নিজেই ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ কমিশন নিয়েছিলেন। তিনি মা ফিলিং স্টেশন ও মা ব্রিক্সে কোনো জামানত ছাড়া ৮ কোটি টাকা ঋণ দেন। তার ছোট ভাই সালাউদ্দিন পান্নার ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পান্না শিপিংয়ের নামে কোনো জামানত ছাড়া ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। এই সব টাকাই ব্যাংক থেকে তুলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। জানা গেছে, বাচ্চু ও পান্না জুটি ঘুষ হিসেবে ব্যাংক থেকে ২ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। দুর্নীতির দায়ে ব্যাংকটির এমডি কাজী ফখরুল ইসলামকে অপসারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তিনি অবশ্য দুর্নীতির দায় স্বীকার করে ক্ষমাও চান। বেসিক ব্যাংকের চট্টগ্রাম খাতুনগঞ্জ শাখার কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন ১ কোটি ২০ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন। জালিয়াতি করে অর্থ পাচারের দায়ে ব্যাংকটির শান্তিনগর, দিলকুশা ও গুলশান শাখার ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এই তিন শাখা থেকে ১ হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে যায়। ব্যাংকটির ডিজিএম মোনায়েম খানের ব্যাংকে স্থায়ী আমানত ৮০ কোটি টাকা। তিনি তার শ্যালক লিটনের নামে ৪০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করান। তার স্ত্রীর ব্যাংকে স্থায়ী আমানত ৫০ কোটি টাকা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন। এদের বিরুদ্ধে দুদক মামলা করেছে।

ব্যাংক লুটের টাকা সুইস ব্যাংকে : গত পাঁচ বছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে যে টাকা লুট হয়েছে, তার বেশিরভাগ চলে গেছে সুইস ব্যাংকে। বাংলাদেশের টাকা পাচারকারীরা মনে করেন সুইজারল্যান্ডের অন্যতম সরকারি ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকে টাকা জমা রাখা বেশি নিরাপদ। এ বছর জুলাই মাসে প্রকাশিত সুইস ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ২০১৩ সালে বাংলাদেশিদের আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭ কোটি ২০ লাখ সুইস ফ্র্যাংক, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ হাজার ২শ ৩৬ কোটি টাকা। ২০১২ সালে এটা ছিল ১ হাজার ৯শ ৫০ কোটি টাকা। ২০১১ সালে ছিল ১ হাজার ৩শ ২০ কোটি টাকা। ২০১০ সালে ২৩ কোটি ৬০ লাখ ফ্র্যাংক, ২০০৯ সালে ১৪ কোটি ৯ লাখ ফ্র্যাংক, ২০০৮ সালে ১০ কোটি ৭০ লাখ ফ্র্যাংক। প্রত্যেক বছরই বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫ থেকে ৮শ কোটি টাকা বেশি পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, এদেশের কোনো নাগরিককে কোনো টাকা বিদেশে নিতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া বিদেশে টাকা নেয়া যায় না। জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সুইস ব্যাংকে টাকা রাখার কোনো নির্দেশ না থাকলেও সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের ৩ হাজার ২শ ৩৬ কোটি টাকা রয়েছে।

অর্থনীতির ভাষায় দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার কারণে টাকা বেশি পাচার হয়। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) 'ইলিসিট ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোজ ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ : ২০০২-১১' শীর্ষক প্রতিবেদন গত বছরের শেষ দিকে প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় ২০১১ সালে দেশ থেকে ২৮০ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা ২২ হাজার ৪শ ৪০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। ২০১০ সালে পাচার করা হয়েছিল ২১৯ কোটি ১০ লাখ ডলার বা ১৭ হাজার ৫শ ২৮ কোটি টাকা। ২০০২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত অবৈধভাবে ১ হাজার ৬০৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার বা ১ লাখ ২৮ হাজার ৬১৬ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় অর্থ পাচারকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ■